নববর্ষ সংখ্যা

বেঙ্গল টাইমস

১৫ এপ্রিল, ২০২৬

নতুন বছরে নতুন আশা

ISSN 2445 5657

সম্পাদকীয়

আশা নয়, আশঙ্কাই বাড়ছে

একদিকে বসন্তের বিদায়। অন্যদিকে নতুন বছরের আগমন। এপ্রিল মাসের দুই অর্ধে দুই বার্তা। কিন্তু এপ্রিল মাস মানে যতটা সম্প্রীতির, ততটাই যেন তিক্ততার। যেমন, এই বছর, রাজ্য জুড়ে জোরকদমে বেজে চলেছে ভোটের দামামা। হুমকি, হিংসা, কুৎসা— কোনওকিছুর বিরাম নেই। শুধু কি এই বছর? দু'বছর আগে এই সময় ছিল লোকসভা ভোটের আবহ। একদিকে মোদির হুঙ্কার, একদিকে দিদির হুঙ্কার— এই নিয়ে ওষ্ঠাগত ছিল বাংলা। তার আগের বছর, অর্থাৎ, ২০২৩ নাগাদ ছিল পঞ্চায়েত ভোটের দামামা। এই ভোটকে ঘিরে গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ আরও দূষিত হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, এই ভোটে সন্ত্রাসও অনেকটাই লাগামছাড়া। রাজ্যের হাতেই সব দায়িত্ব। ফলে, কেউ বলার নেই। শাসকের মাতব্বরি কার্যত একতরফা হয়ে যায়।

তাই পয়লা বৈশাখ বলতে একসময় যে সম্প্রীতির আবহ ছিল, তা বহুকাল আগেই বঙ্গজীবন থেকে যেন উধাও হয়ে গেছে। এই দিনটার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিল না। তাই এই দিনটা যতটা হিন্দুদের, ততটাই ছিল মুসলিমদের। এপার বাংলা, ওপার বাংলা দিব্যি মিশে যেত এক সুরে। যদিও

ওপার বাংলায় দীর্ঘ অরাজকতার পর অনেকটাই শান্তি ফিরেছে। গত বছর যে পরিস্থিতি ছিল, তার থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত। প্রতিবেশী হিসেবে এটা অবশ্যই স্বস্তির। কিন্তু এপার বাংলায় ভোটের আবহে যে ধর্মীয় মেরুকরণের আবহ তৈরি হচ্ছে, তা বেশ দুশ্চিন্তার। এই বাংলায় রাজনৈতিক চাপানোতর আগেও ছিল। কিন্তু ধর্মকে ঘিরে এমন উস্কানিমূলক প্রচার ছিল না। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছেন, সত্যিই তাঁদের রাষ্ট্রনায়ক ভাবতে কষ্ট হয়। এঁরা সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছেন! এঁরা দেশের সংবিধানকে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে রক্ষা করবেন! সত্যিই এই দেশের বড় দুর্দিন।

রাজ্যের শাসকও হয়তো চাইছেন এমন আবহই থাকুক। ভয়ের আবহে অন্তত একটি সম্প্রদায়ের ভোট নিশ্চিত করা যাবে। রাজ্যের দুর্নীতি, অরাজকতা নিয়ে প্রশ্নগুলো আড়ালেই থেকে যাবে। হিন্দু আর মুসলিমকে লড়িয়ে দিতে পারলে দুই তরফেই সুবিধা। তাহলে নিজের নিজের ব্যর্থতাগুলো কী সহজেই চাপা পড়ে যাবে! বামেরা সম্প্রীতির কথা, রুটিরুজির কথা, শিক্ষার কথা বললেও এই ধর্মীয় উন্মাদনার আবহে সেই কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। উদ্বেগের হলেও এটাই বাস্তব।

তাই এই পয়লা বৈশাখ কোনও স্বস্তির বার্তা নিয়ে নয়, বরং হিংসা আর বিদ্বেষের বার্তাই বয়ে আনছে। সামনের দিনগুলো সুন্দর হবে? এমন আশা করা সত্যিই বড় কঠিন হয়ে পড়ছে।

শুধু একটি বছর

রক্তিম মিত্র

আরও একটা নতুন বছর। অবশ্য নতুন বছর বললেই আমরা ইংরাজির ক্যালেন্ডার বদলের কথা ভেবে নিই। বাংলাতেও যে আলাদা একটা বছর আছে, সেটা আমরা ভুলেই যাই। বাংলার কোন মাস চলছে, অনেকেই বলতে পারি না। তারিখ তো দূর অস্ত। এমনকী এটা কোন বছর, সেই প্রশ্নেও অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। বিস্তর ভাবার পর একটা ভুল উত্তর। আসলে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এভাবেই বাংলা যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

পয়লা বৈশাখ অবশ্য কতগুলো অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। আমরা নতুন পাঞ্জাবি পরি। শাড়ি আর গয়নার দোকান বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেয়। কোন বাঙালি রেস্তোরাঁয় কী বিশেষ বাঙালি মেনু আছে, তা নিয়ে কাগজে ফিচার বেরোয়। টিভি খুললেও অ্যাঙ্করদের পরণে একটু অন্যরকম পোশাক। একটু অন্যরকমের আড্ডা, অনুষ্ঠান। আর সকাল হলেই হোয়াটসঅ্যাপের সুবাদে নানা রকমের পয়লা বৈশাখের মেসেজ। আমাদের বাঙালিয়ানা এটুকুতেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে বাংলার চর্চা থেকে অনেকটা বিরতই থাকি। আমাদের বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে যাওয়া বহুকাল আগেই শুরু করেছে। ইদানীং যেটা দেখা যাচ্ছে, তা হল, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও বাংলা থাকছে না। সেখানেও বাঙালি বাড়ির ছেলেরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকে বেছে নিচ্ছে। ফলে, আগে যে একটা পেপার বাংলা পড়তে হত, সেটুকুও আর হচ্ছে না। অভিভাবকরাও পরম গর্বে বলে বেড়াচ্ছেন, 'ওর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো হিন্দি। ওদের স্কুলে বাংলা পড়ানোই হয় না।' স্কুলগুলিরও গর্বের সীমা নেই। অন্য কোনও রাজ্যে মাতৃভাষার প্রতি এমন উপেক্ষা আছে কিনা জানা নেই।

বাংলা এফএম-এ একটা বকচ্ছপ বাংলা বলা হয়। কিঁউকি, কেনকী এসব শব্দ আমাদের দৈনন্দিন সংলাপে অহরহ ঢুকে পড়ছে। সিরিয়ালের হাত ধরেও অবাধে ঢুকে যাচ্ছে হিন্দি গান। বাঙালির বিয়ে বাড়ির মেনু কার্ডও বদলে গেছে। বিয়ের আসরে এখন মেহেন্দি আর সঙ্গীত। পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে যাচ্ছে।

গত এক বছরে একটা বই পড়েছেন, এমন বাঙালির সংখ্যা কত? রাজ্যের মোট বাঙালির ১ শতাংশ এমন পাওয়া যাবে? চারপাশ দেখে মনে তো হয় না। এক বছরে একটা ভাল বাংলা সিনেমা দেখেছেন, সেই সংখ্যাটাই বা কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা ২ শতাংশের বেশি হবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, গত এক বছরে অন্তত একবার লাইব্রেরি গেছেন, এমন বাঙালি কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই এক শতাংশে পৌঁছবে না। এই নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে, চারপাশে তাকালেই ছবিটা বোঝা যায়।

নতুন বছরে আমরা তাহলে কী করব? বাংলা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা বলে একটা বিকৃত আনন্দ পাব? নাকি হাহুতাশ করে যাব? এসব পন্থা ছেড়ে নিজেদের জীবন যাপনে যেন একটু হলেও বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই চেষ্টাই বোধ হয় করা উচিত। না, বাংলা ভাষার জন্য মিছিল করতে হবে না, প্রাণ দিতেও হবে না। মাসে অন্তত একটা ভাল বই পড়া, একটা ভাল বাংলা ছবি দেখা, অন্তত একটা চিঠি লেখা, কয়েকটা গান শোনা— এটুকু তো করতে পারি। তাহলেও পরের প্রজন্ম কিছুটা বাংলার ছোঁয়া পাবে। এটুকুও যদি না পারি, তাহলে পয়লা বৈশাখের পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে আদিখ্যেতা না করাই ভাল।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

কুন্তল আচার্য

পয়লা বৈশাখ ব্যাপারটা ঠিক কী? যখনই এই তারিখটা আসে, নানারকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হাজির হয়ে যায়। ভারতের কোন কোন রাজ্যে কী নামে তা পরিচিত। কোন রাজার হাত ধরে কীভাবে এর বিস্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কেউ একটা যদি ফেসবুকে ছাড়ল, তাহলে তো কথাই নেই। একদল সেটাকে শেয়ার করতে ব্যস্ত রইল। আরেকদল বলা নেই, কওয়া নেই, কপি পেস্ট করে নিজের নামে ঝেঁপে দিল। তারপর সারাদিন লাইক গুনতে লাগল।

যাক গে সেসব কথা। আমাদের ছোটবেলাটা ছিল বড় অদ্ভুত। আমাদের সময় টিভিও সেভাবে মফস্বলে ঢোকেনি। আর সেলফোন, গুগল, ফেসবুক তো অনেক পরের ব্যাপার। এসব শব্দ তখন কালের গর্ভে। সে ছিল এক নিখাদ আনন্দের দিন। এমনিতে তখন শীত অনেকটাই লম্বা ছিল। এই সময়টায় পরীক্ষার ভ্রূকুটি ছিল না। এই সময়টায় গাজন, মেলার ধুম। কবে কোথায় মেলা হবে, তার একটা মোটামুটি ক্যালেন্ডার ছিল। সেই অনুযায়ী আশেপাশের কোনও মেলা বাদ দিতাম না।

কিন্তু পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য কারণে

আনন্দের। দোকানগুলো দারুণভাবে সেজে উঠত। অনেক দোকানের বাইরে ফুল টাঙানো হত। ঝাড়পোছ চলত। অনেক দোকানের বাইরে চেয়ার পেতে, ছোটখাটো প্যান্ডেল সাজানো হত। যেসব দোকানে সারা বছরের টুকটাক কেনাকাটা, সেইসব দোকানে একবার করে হাজিরা দেওয়া। কোনওটা বড়দের সঙ্গে। কোনওটা আবার বন্ধুদের সঙ্গে। কোনও দোকানে মিষ্টির প্যাকেট। কেউ আবার বসিয়েই মিষ্টি খাওয়াতেন। দোকানিদের প্রণাম করতাম। অন্যান্য বড়দেরও প্রণাম করতাম।

তবে মিষ্টি বা লাড্ডুকে ঘিরে অবশ্য আমাদের সেই আবেগ ছিল না। তাই আমরা খোঁজ নিতাম, কোন দোকানে লস্যি খাওয়াচ্ছে। কোন দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াচ্ছে, কোন দোকানে আইসক্রিম দিচ্ছে। ছোটদের জন্য এইসব আয়োজনও থাকত। আমাদের সময়ে গোল্ড স্পট বলে এক ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল। এমন সুন্দর একটা পানীয় কোথায় যে হারিয়ে গেল! এভাবেই কত দোকানে যে ঢুঁ মারতাম! দোকানিরাও ছিলেন দিলখোলা। সেই দোকানে জিনিস না নিলেও তাঁদের মধ্যে নিমন্ত্রণের ছুৎমার্গ ছিল না। ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। আমরাও সেই মতো আশপাশে ঘুরঘুর করতাম।

প্যাকেটগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরতাম। আর দেওয়া হত ক্যালেন্ডার। ওতে অবশ্য আমাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ, বাংলা ক্যালেন্ডার মানেই বড্ড বোরিং। সেই ঠাকুর দেবতার ছবি। ওতে তেমন মতি ছিল না। ফলে, সেগুলো ঘরের লোকেদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের ধন্য করতাম।

তখন পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল হালখাতা। অনেক দোকানে নাকি ধার দেনা শোধ করতে হয়। অনেকে দেখতাম, দোকানির হাতে কয়েকশো টাকা ধরিয়ে দিচ্ছেন। দোকানিও সেগুলো খাতা দেখে মিলিয়ে নিচ্ছেন। কেউ আবার হিসেব–টিসেবে যাচ্ছেন না। কে কত জমা করল, জাস্ট লিখে রাখছেন। হিসেবে পরে হবে। আমরা অবশ্য এসব চক্করে ছিলাম না। আমাদের টাকা কোথায় যে ধার মেটাব! ও বাবা–কাকাদের কাজ। আমরা বুঝি লস্যি, আমরা বুঝি কোল্ড ড্রিঙ্কস। কে কেমন খাওয়াল, এটাই ছিল আমাদের কাছে সেই দোকানের ইউএসপি। কার দোকানে মাল কেমন, কে সস্তায় দেয়, কার ব্যবহার কেমন, এগুলো বড়রা বুঝুক, আমাদের বুঝতে বয়েই গেছে।

সবমিলিয়ে আমাদের কাছে পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য এক উন্মাদনা। যার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। এখনকার পয়লা বৈশাখের সঙ্গে সেদিনের সেই নির্মল আনন্দের কোনও তুলনা হবে না। সত্যিই, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত আসলে গ্রীষ্মের তিন রূপ

তৃষাণ রুদ্র

জিজ্ঞাস করুন, এটা বাংলার কোন সাল। অধিকাংশক্ষেত্রেই আপনি সঠিক উত্তর পাবেন না। উত্তরদাতা হয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন। নইলে, উনিশশো, দুহাজার এইসব বলে থমকে যাবেন। নইলে অতি চালাকি করে এড়িয়ে যাবেন। বলবেন, এখন এগুলো মনে রাখার কোনও দরকার নেই। এগুলো সব সেকেলে ব্যাপার।

সত্যিই তাই, বাংলা সাল, বাংলা তারিখ এগুলো কেমন যেন গুরুত্ব হারিয়েছে। অবশ্য এর জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাও অনেকটাই দায়ী। ছোট থেকে যে ঋতুচক্রের কথা পড়েছিলাম, সেই সব ঋতু গুলো কোথায় যেন ভ্যানিস হয়ে গেল। আচ্ছা, শরৎ কাল কালে বলে? হেমন্ত বা বসন্ত বলেও কার্যত কিছুই নেই। শুনতাম, পৌষ-মাঘ এই দুম মাস নাকি শীতকাল। ও হরি, কোথায় বা কী? মেরেকেটে শীত এখন দশ-বারো দিনের অতিথি। তাও একটানা নয়। জানুয়ারির শুরুতে হয়ত একঝটিকায় তিনদিন। দিন পনেরো পরে অস্তিত্বের জানান দিতে হয়ত আরও তিন-চার দিন। আর বর্ষা! মাঝে মাঝে টানা হয় ঠিকই। কিন্তু সেও আর দু'মাসের ঋতু নেই। সবমিলিয়ে দিন পনেরো।

তাহলে, মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল? বছর অন্তত দশ মাস গরম কাল। বাকি দু'মাসের কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীত। বাঙালির এখন ঘরে এসি, অফিসে এসি, পার্টি অফিসে এসি, ক্লাবঘরেও এসি। ফলে, ঘরকুনো বাঙালি ঘরের মধ্যে থাকলে গরমটা বুঝতেও পারে না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারে। কিন্তু বাইরে বেরোনোও কমিয়ে দিয়েছে। আর ঘরে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে এসেছে স্মার্টফোন। সে সারাদিন স্মার্ট ফোনেই মুখ গুঁজে। ফলে, ঘরের ভেতরের বা বাইরের ঋতুচক্র নিয়ে ভাবতে তার বয়েই গেছে। সে খুব গরম এলে বড়জোর, দু একটা গরমের পোস্ট শেয়ার করে।

আমাদের ছোটবেলায় শরৎকাল, বসন্তকাল নিয়ে রচনা আসত। কেউ কেউ ঝেড়ে মুখস্থ করত। আবার কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে এটা-সেটা কিছু একটা লিখে আসত। এখনকার যা সিলেবাস, বোধ হয় এসব রচনা আর আসে না। আর এলেও বানিয়ে লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ, শরৎকালের সঙ্গে বসন্তকালের কী ফারাক, দৈনন্দিন জীবনে তা বুঝে ওঠার সত্যিই কোনও উপায় নেই। দুটোই আসলে গরমকালের দুই রূপ।

এক ঘণ্টায় যদি বই আসত!

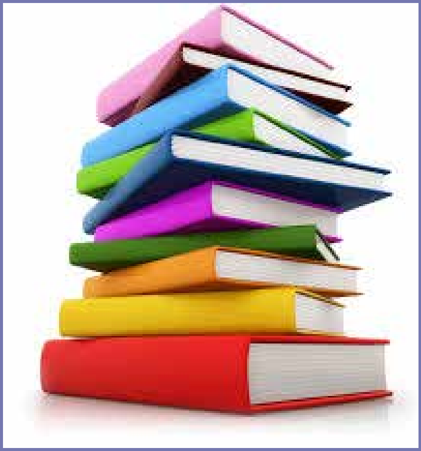

উত্তম জানা

কয়েক বছর আগেও যা ভাবা যেত না, আজ তা কত সহজে আয়ত্বে এসে গেছে। কোনও একটা অ্যাপে আপনি খাবারের অর্ডার দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে তা আপনার দরজায় হাজির। এমনটা কি ভাবা গিয়েছিল? আগে ট্যাক্সি পেতে আপনাকে কত ঝক্কিই না পোহাতে হয়েছে। ট্যাক্সি চালকের কাছে কতবার 'না' শুনতে হয়েছে। এখন চূড়ান্ত অসময়েও আপনার বাড়ির দরজায় অত্যাধুনিক গাড়ি এসে হাজির।

কিন্তু আমি অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। অ্যাপের মাধ্যমে অনেক কিছুর মতো বইও অর্ডার দেওয়া যায়। সেটিও আপনার বাড়িতে পৌঁছে যায়। কিন্তু বড্ড দেরিতে। একটা বিরিয়ানির প্যাকেট আধঘণ্টায় চলে আসছে, সেখানে একটা বই পৌঁছতে দশ বারো দিন লেগে যাচ্ছে। এত দেরি কেন? এতে তো অর্ধেক আকর্ষণই চলে যাচ্ছে। আপনি আপনার পছন্দের কারও জন্মদিনে একটা ভাল বই উপহার দিতে চান, কিন্তু তা কবে পৌঁছোবে, আপনি নিজেও জানেন না। বা আপনার কোনও বই পড়তে ইচ্ছে হল, আপনি জানেন, সেটা সাতদিনের আগে আসবে না। এতে আপনার ভেতরের ইচ্ছেটাই যেন চলে গেল। অর্ডার দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আপনি থমকে গেলেন।

পছন্দের খাবার যদি আধ ঘণ্টায় পাওয়া যায়, পছন্দের বই পেতে এত দেরি কেন? ফুড ডেলিভারি অ্যাপ যদি এত দ্রুত কাজ করতে পারে, বুক ডেলিভারি অ্যাপ কি আরও একটু গতিশীল হতে পারে না? বড় খাবারের দোকান যেমন আছে, তেমনই বড় বইয়ের দোকানও তো আছে। তাঁরা এত পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরা কি দ্রুত বই পৌঁছে দেওয়ার একটা উপায় বের করতে পারেন না? বাংলার প্রকাশকরা একটু ভেবে দেখতে পারেন।

পায়ে হেঁটেই নববর্ষের আড্ডায় হাজির দাদাঠাকুর

পোশাকি নাম সবিতেন্দ্রনাথ রায়। বইপাড়ায় জনপ্রিয় নাম ভানুবাবু। নববর্ষ মানেই তাঁর দোকানে লেখকদের জমজমাট আড্ডা। অনেক স্মৃতি সযত্নে আগলে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় স্বরূপ গোস্বামী।।

কখনও এসে গান ধরেছেন দাদাঠাকুর। কখনও আপন মনে কবিতা বলে চলেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তরুণদের উৎসাহ দিচ্ছেন তারাশঙ্কর। আবার খুব সঙ্কোচে নিজের নতুন লেখার কথা শোনাচ্ছেন শঙ্কর। কখনও হাজির হেমন্ত্ মুখোপাধ্যায়, তো কখনও আসর জমিয়ে দিচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরাতনী টপ্পা ধরছেন বুদ্ধদেব গুহ, নীরব শ্রোতা লীলা মজুমদার। নববর্ষ মানেই টুকরো টুকরো এমন নানা মুহূর্ত। নববর্ষ মানেই মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর সেই জমজমাট আড্ডা। দুপুর গড়িয়ে যেত বিকেলের দিকে, সন্ধে গড়িয়ে যেত রাতে। এক প্রজন্মের সঙ্গে দিব্যি মিশে যেত আরেক প্রজন্ম। কিন্তু এসব আড্ডার কথা কে আর শোনাবেন! পুরনো মানুষেরা একে একে সবাই প্রায় চলে গেছেন। কিন্তু পুরনো অনেক স্মৃতি আগলে বসে আছেন এক প্রবীণ প্রকাশক।

হ্যাঁ, তিনি মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর কর্ণধার সবিতেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশনার জগৎ যাঁকে একডাকে চেনে ভানুবাবু নামে। বয়স আশির গন্ডি ছাড়িয়েছে অনেকদিন। বয়স এখনও সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি স্মৃতিতে। এখনও উঠে পড়েন সাতসকালে। নানারকম বই, ম্যাগাজিন পড়তে থাকেন। নিজের হাতে প্রুফ দেখেন। বারোটা

বাজতে না বাজতেই হাজির হয়ে যান কলেজ স্ট্রিটের মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এ। লেখকরা আসেন, পাঠরাও আসেন। অনেক নতুন পান্ডুলিপি পড়তে হয়। সন্ধে পর্যন্ত সেখানেই কেটে যায়। ফিরে এসেও বসে পড়েন বই নিয়ে। ভদ্রতা বা সৌজন্যে কোনও কার্পণ্য নেই। ফোন করে এক সন্ধেয় হাজির হয়েছিলাম তাঁর ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। বাড়ি নয়, যেন জীবন্ত এক ইতিহাস। কত কিংবদন্তি সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত সেই ঘর। কথায় কথায় নববর্ষের আড্ডা। কখনও নববর্ষকে ছাপিয়ে উঠে এল প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা কথা। সেই আলাপচারিতার কিছুটা নির্যাস বরং তুলে ধরা যাক।

প্রশ্নঃ বাংলা নববর্ষ মানেই তো আপনার দোকানের সেই জমজমাট আড্ডা।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, দেখতে দেখতে সেই আড্ডার বয়স সাতষট্টি বছর হয়ে গেল। মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর পথ চলা শুরু ১৯৩৪-এ। খুব অল্প বয়সেই আমি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। তবে নববর্ষের আড্ডা বলতে যা বোঝায়, তা শুরু হয় ১৯৪৯ নাগাদ। তখন থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যিকরা আসতেন। যত দিন গেল, সেই আড্ডার কথা ছড়িয়ে গেল। সেই সময়ের অধিকাংশ বড় বড় লেখকই একবার না একবার ঢুঁ মেরে যেতেন সেই আড্ডায়। তবে পয়লা বৈশাখ খুব ভোরেই যাই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে বারোটা নাগাদ যাই দোকানে। তখন থেকেই সাহিত্যিকদের আসা যাওয়া শুরু। একেক সময় একেকজন আসতেন। আড্ডা চলত রাত নটা-দশটা পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ সেই আড্ডায় নাকি দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিতও আসতেন। তিনি আসা মানেই অনেক মজার মজার ঘটনা। সেগুলো মনে পড়ছে ?

ভানুবাবুঃ দাদাঠাকুর মানেই এক বর্ণময় চরিত্র। তিনি বেশ কয়েকবার এসেছেন এই আড্ডায়। আর তিনি থাকা মানে তিনিই হয়ে উঠতেন মধ্যমণি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার ব্র্যাবোর্ন রোডে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললাম, যাবেন না ? বললেন, হ্যাঁ, তোদের ওখানে তো একবার যেতেই হবে। আমি বললাম, দাঁড়ান, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি। উনি বললেন, 'ট্যাক্সির দরকার নেই। দা আছে দুটো, কুড়ুল আছে একটা। কাটতে কাটতে চলে যাব।' দা-কুড়ুল মানে বুঝলাম না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, ওরে, আমার নামের শুরুতেই দাদা, অর্থাৎ দুটো দা। আর ঠাকুরকে একটু উল্টে-পাল্টে দিলেই কুঠার হয়ে যাবে। পায়ে হেঁটেই চলে এলেন। এসে একাই জমিয়ে দিলেন। গান ধরলেন কলকাতা ভুলে ভরা। আড্ডায় সজনীকান্ত দাসও হাজির। তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন, 'দাদাঠাকুর, কোথায় যাবেন, বলুন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে ছেড়ে দেব।' দাদাঠাকুর বললেন, 'সারা জীবনে অনেক পাপ করেছিস, আমাকে গাড়ি চাপিয়ে একটু পুণ্যি সঞ্চয় কর।' সজনীকান্ত বললেন, কেন, কী পাপ করেছি ? দাদাঠাকুর বললেন, 'কত নিপাতনে সিদ্ধ লেখককে মেরে ফেলেছিস। দিকপাল সব লেখককে কত গালমন্দ করেছিস। এটা পাপ নয় !'

প্রশ্নঃ আর কারা আসতেন ?

ভানুবাবুঃ কাকে ছেড়ে কার কথা বলব ?

তারাশঙ্কর থেকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত থেকে প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত

দাস, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শঙ্কর, নিমাই ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত সরকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার। এখনও সেই আড্ডা বসে। এখন এই প্রজন্মের লেখকরা আসে। ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রচেত গুপ্তরা একবার না একবার ঠিক আসে। বুদ্ধদেব গুহ নিয়মিত আসতেন। পুরাতনী টপ্পা গাইতেন। কিন্তু স্ত্রী ঋতু গুহ মারা যাওয়ার পর থেকে আসেননি। কেউ প্রবীণ, কেউ আবার তখন সবে সাহিত্য জগতে পা রেখেছেন। নবীন-প্রবীণ মিলে যেত ওই একটা দিনে।

প্রশ্নঃ শুধু লেখকরা ? অন্য জগতের লোকেরা আসতেন না ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তাও আসতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। সবাই গান গাওয়ার আবদার করল। হেমন্তবাবু বললেন, গান করতে তো আসিনি। এসেছি গজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই মিলে কত আড্ডা হচ্ছে, এই তো ভাল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রতিবারই আসতেন। তিনি থাকলে যা হয় ! একাই আসর জমিয়ে দিতেন। একবার ভানু বাবু একটা বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন। আমি বললাম, কাউন্টারে যাবেন নাকি ! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই কিনব ? ক্ষেপেছিস ? আমাকে বই কিনতে দেখলেই লোকজন গালাগাল দেবে। বলবে, এই দেখ, শালা ভানুও বই পড়ছে। উত্তম কুমার বই পড়লে ক্ষতি নেই। আমি বই পড়লেই যত দোষ। যেন আমার বই পড়ারও যোগ্যতা নেই।' একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে এক সমস্যা। বীরেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। তিনি এসেই বললেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অভদ্র। এক ট্রামে একসঙ্গে এলাম। কোনও কথাই বলল না। যা জিজ্ঞেস করলাম, শুধু হুঁ হুঁ করে গেল। এ কেমন ভদ্রতা ? তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'মুখ খুলে কি বিপদ বাড়াব ? মুখ খুললেই তো আওয়াজ শুনে লোকে বুঝে যেত, বীরেন্দ্র ভদ্র যাচ্ছে। এরকম নানা টুকরো টুকরো ঘটনা। সব একসঙ্গে মনেও পড়ে না।

প্রশ্নঃ সেদিন এত লেখককে সামাল দিতেন কী করে ? সবাই কি মাটিতেই বসতেন ?

ভানুবাবুঃ দোকানে বসার জায়গা কোথায় ? দোকান তো বইয়ে ঠাসা। পয়লা বৈশাখ বিক্রি একটু বেশি হয়। ফলে, আরও বেশি বই রাখতে হত। এর মাঝে আলাদা করে বসার আয়োজন করা মুশকিল হয়ে যেত। তারই মাঝে কিছু চেয়ার, কিছু টুল থাকত। অনেকে মাটিতেও বসতেন। তাছাড়া, সবাই তো একসঙ্গে থাকতেন না। কেউ হয়ত দুপুরে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চলে যেতেন। কেউ আসতেন বিকেলের দিকে। সবমিলিয়ে কুলিয়ে যেত। সমস্যা হত না। আসলে, কে টুলে বসলেন, কে বইয়ের উপরে বসলেন, এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতেন না। সবাই একসঙ্গে হই হুল্লোড় করতেন, সেটাই আসল কথা।

প্রশ্নঃ নিশ্চয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন থাকত। লেখকদের কী উপহার দিতেন ?

ভানু বাবুঃ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত খাওয়া দাওয়ার পর্ব। সারাক্ষণই চলত। কখনও মিষ্টি, কখনও নোনতা। আলুর দম, ফুচকা, চুরমুর, সব ব্যবস্থাই থাকত। আর দফায় দফায় চা, কফি, শরবত তো আছেই। কেউ ভোজনরসিক,

তিনি হয়ত একটু বেশি খেলেন। কেউ বাড়ি থেকে খেয়ে আসতেন। তিনি দু একটা মিষ্টি মুখে তুলতেন। কেউ প্যাকেটে করে বাড়ি নিয়ে যেতেন। সবমিলিয়ে একটা উৎসবের পরিবেশ থাকে। লেখকদের নানারকম উপহার দেওয়া হয়। দামি পেন, ফোল্ডার, বই তো থাকেই। বিভিন্ন বছরে নানারকম উপহার। তবে উপহার যা দেওয়া হবে, সবাইকে একইরকম। বই দেওয়া হলে, সবাইকে একইরকম বই দেওয়া হয়। তবে জীবিত লেখকদের বই সাধারণত দেওয়া হয় না। এক লেখকের বই দেওয়া হলে অন্য লেখকের খারাপ লাগতে পারে। তাই মৃত লেখকদের বইই দেওয়া হয়। একবছর দিয়েছিলাম 'খেয়ালখুশির খাতা।'

প্রশ্নঃ খেয়াল খুশির খাতা! সেটা আবার কার লেখা ?
ভানুবাবুঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকরা এসে একটা খাতায় যা খুশি লিখে রাখতেন। নানা মজার মজার মন্তব্য। সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের নানা মজার কথা আছে এই খাতায়। একটা ঐতিহাসিক দলিলও বলতে পারেন। সেই মন্তব্য গুলোই দু বছর আগে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। সাহিত্যের অনেক অজানা দিক সেখানে আছে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, পয়লা বৈশাখ নাকি লেখকদের সম্মান দক্ষিণাও দেওয়া হয়। আপনার এখানেও কি সেই ট্রাডিশন আছে ?
ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, এই ট্রাডিশনটা অনেকদিনের পুরানো। পয়লা বৈশাখ লেখকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়। তবে সবসময় পুরোটা দিতে পারি না। চেষ্টা করি, ওই দিন অন্তত কিছুটা দেওয়ার।

সবার পাওনা সমান হয় না। কারও হয়ত পাঁচটা বই আছে, কারও একটা। কারও নতুন বই নেই, কিন্তু পুরানো বই বাবদ রয়্যালটি আছে। তাই সবার টাকার অঙ্কটা সমান হয় না। যার যেমন পাওনা, সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা খাম তৈরি থাকে।

প্রশ্নঃ ওই দিন কি বইয়ে উদ্বোধনও হয় ?
ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, অনেক লেখক ওই দিন বই প্রকাশ করতে চান। তবে এখন আর ঘটা করে উদ্বোধন করি না। এর একটা কারণ আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বইটার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। ওই বইটা পয়লা বৈশাখ বেরিয়েছিল। দাম ছিল কুড়ি টাকা। সেদিন বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বই কেনার জন্য এমন হুড়োহুড়ি, সামাল দেওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিনে দশ হাজার কপি শেষ। কলেজ স্ট্রিটের অন্য প্রকাশকদের ব্যবসা সেদিন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে আর ঘটা করে উদ্বোধন হয় না। তবে ওই দিন পাঠকদের মধ্যেও বই কেনার একটা বাড়তি তাগিদ থাকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা

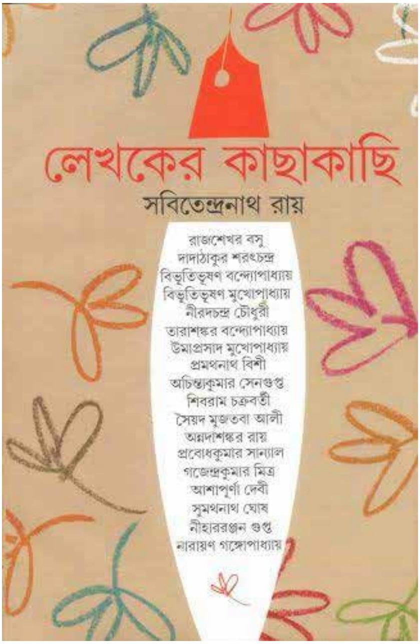

ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। তার থেকেও বড় আকর্ষণ, ওই দিন দোকানে এলে লেখকদের হাতের কাছে পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাঁদের দিয়ে বইয়ে সই করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ সেদিনের পয়লা বৈশাখ আর এদিনের পয়লা বৈশাখ। তফাতটা কোথায় ? সেই জৌলুস কি আর আছে?

ভানুবাবুঃ সবকিছুতেই তো জৌলুস কমছে। পয়লা বৈশাখের আড্ডাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখনও আড্ডা হয়। এই সময়ের অনেক লেখক আসেন। কিন্তু সেই প্রাণটা যেন থাকে না। আসলে, এখন সবাই বড় ব্যস্ত। আগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক নতুন লেখকদের লেখা পড়তেন। উৎসাহ দিতেন। এখন সেই পড়ার আগ্রহ দেখি না। একজন আরেকজনের লেখা না পড়লে সেই একাত্মতা আসে না। সেই বর্ণময় চরিত্রও নেই। সেই আড্ডা দেওয়ার অবসরও নেই। আগে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হত। এখন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রশ্নঃ এখনকার লেখকরা তাহলে পড়ছেন না !

ভানুবাবুঃ সবার সম্পর্কে এমনটা বলা হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু সার্বিকভাবে বলতে গেলে, পড়ার আগ্রহটা সত্যিই কমেছে। ভাল লেখা না পড়লে নিজের লেখাও সমৃদ্ধ হবে না। জীবনকে আরও গভীরভাবে দেখতে হয়। যে বিষয়টি নিয়ে লিখছেন, সেটি আরও ভালভাবে জানতে হয়। এই জানার চেষ্টাটাই অনেকের মধ্যে দেখি না। কিন্তু একজনের নাম বলতেই হবে, সমরেশ মজুমদার। ও কিন্তু কোনও বিষয়ে লেখার আগে সেটা ভালভাবে জেনে নেয়। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ওর কোনও সঙ্কোচ নেই। মাঝে মাঝেই ও ফোন করে অনেককিছু জানতে চায়। যেটা জানি, সেটা বলি। অন্যদের কাছেও জানতে চায়। কিন্তু এই অভ্যেসটা বাকিদের মধ্যে দেখি না। তারা হয়ত ভাবে, কিছু জানতে গেলে হয়ত ছোট হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, প্রকাশকদের নাকি লেখকদের থেকেও অনেক বেশি পড়তে হয়।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, লেখকদের না পড়লেও চলে। কিন্তু প্রকাশককে পড়তেই হয়। তার কোনও ফাঁকিবাজি চলবে না। বইয়ের পান্ডুলিপি পড়েই বুঝতে হয়, এই বই চলবে কিনা। চললে, কখন চলবে। শুধু লেখকের নামে তো বই কাটে না। ভাল বিষয়ও থাকতে হয়। আবার অনামী লেখকের ভাল বইও অনেক সময় মানুষের কাছে পৌঁছয় না।

প্রশ্নঃ এখন যদি কোনও লেখকের উপর বাজি ধরতে হয়, কার উপর ধরবেন ?

ভানুবাবুঃ প্রথমেই সমরেশ মজুমদার। লেখার একটা অদ্ভুত বাঁধুনি আছে। বিষয়টাকে ভালভাবে জেনে, তারপর লেখে। যা লেখে, সবাই বুঝতে পারে। এরপর নবনীতা দেবসেন। ওর লেখার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভ্যারিয়েশন আছে। সব ধরনের লেখাই লিখতে পারে। আর এই সময়ের লেখকদের মধ্যে বেছে নেব প্রচেত গুপ্তকে। ওর গল্প বলার কায়দাটা ভারী অদ্ভুত। অনেক ছোটখাটো বিষয়কেও লেখার গুনে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এমন একটা আকর্ষণ আছে, যা আপনাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ প্রকাশকের পাশাপাশি আপনি নিজেও তো একজন লেখক। কিন্তু লোকে বলে, অনেক দেরিতে কলম ধরলেন। এর জন্য আফসোস হয় না ?

ভানুবাবুঃ সে অর্থে আমি লেখক নই। আমি মূলত একজন প্রকাশক। লেখকদের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু শিখেছি। দোকানে অনেক দিকপাল মানুষ আসতেন। কবিশেখর কালিদাস রায় বলে-ছিলেন, ‘এখানে যা আলোচনা হয়, তা লিখলেই একটা ভাল বই হয়ে যায়।’ কিন্তু আমি তো আর লেখক নই। তবু যে সব ঘটনা মনে দাগ কাটত, নোট করে রাখতাম। সেইসব স্মৃতি নিয়ে লিখেছি-লাম ‘কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর’। এটা আমার আত্ম-কথাই বলতে পারেন। এই বই পড়লে লেখকদের অনেক কথা জানতে পারবেন। পরে অনেকে বলল, বিভিন্ন লেখকদের সঙ্গে স্মৃতিকথা তুলে ধরতে। তখন লিখলাম, ‘লেখকের কাছাকাছি’।

প্রশ্নঃ কোন বই কেমন চলবে, আগাম বুঝতে পারেন ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, পারি। অভিজ্ঞতা থেকেই পারি। এর জন্য নিজেকে পাঠক হতে হয়, পাঠকের পালস বুঝতে হয়। কোনও বই হয়ত শুরুতে তেমন ছাপ ফেলে না। কিন্তু যত দিন যায়, কদর বাড়ে। সেটাও আগাম বুঝতে হয়। আবার কোনও বই শুরুতে দারুণ বিক্রি হলেও পরের দিকে থেমে যায়। পাঠকদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি। সবমিলিয়ে একটা পালস বুঝতে পারি।

প্রশ্নঃ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েও, এই বয়সেও নিজেই নাকি প্রুফ দেখেন।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তা দেখতে হয়। সব না হলেও কিছু তো দেখতেই হয়। লেখকরাও সবসময় প্রুফ দেখতে পারেন না। বড় লেখক হলেই নির্ভুল বানান লিখবেন, এমনটা সচরাচর হয় না। কাজটাকে ভালবাসি তো, তাই যত্ন নিয়েই করি। চেষ্টা করি, যতটা সম্ভব, নির্ভুল ছাপতে। কোথাও কোনও বানান ভুল থাকলে কষ্ট হয়। তাই, এই বয়সেও যতটা পারি, চেষ্টা করি।

(লেখাটি তিন বছর আগে পয়লা বৈশাখ বেঙ্গল টাইমসেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই পয়লা বৈশাখ আবার ছাপা হল। সাক্ষাৎকারটি এখনও একইরকম প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।)

ট্রামকে আমরা আদৌ বাঁচিয়ে রাখতে চাই তো!

উত্তম দাস

খুব ঘটা করে পালিত হল কলকাতায় ট্রামের ১৫০ বছর। অর্থাৎ, ঠিক ১৫০ বছর আগে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এই শহরে প্রথম ট্রাম চলেছিল। হ্যাঁ, ঘটা করে পালিত হওয়ারই কথা। কিন্তু কলকাতায় ট্রাম এখন যেন শিবরাত্রির সলতে। বছর দশেক আগেও নাকি ২৬টি রুটে ট্রাম চলত। কমতে কমতে এখন দুটি রুটে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সকলের চোখের সামনে কীভাবে একটু একটু করে ট্রাম হারিয়ে গেল! আমরা বুঝতেও পারলাম না।

সেদিন সকালে আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম। বলা যায়, পুরনো কলকাতা অভিযানে। ইচ্ছে ছিল, প্রথমে ট্রামে চড়ে খিদিরপুর যাব। সেখান থেকে মেটিয়াবুরুজের ইমামবাড়ায়। বলা ভাল, নবাব ওয়াজেদ আলির সমাধিক্ষেত্রে। অর্থাৎ, এক হেরিটেজে চড়ে আরেক হেরিটেজে।

শীতকালে মাঝে মাঝেই আমরা কয়েকজন এভাবে বেরিয়ে পড়ি। হয়ত হারানো শৈশব, কৈশোরকে খুঁজে বেড়াই। হয়ত সেই ফেলে আসা কলকাতার গন্ধ নিতে যাই। কিন্তু হায়, ধর্মতলায় গিয়ে দেখলাম, ট্রামের দেখা নাই রে, ট্রামের দেখা নাই।

বছর তিনেক আগে বার দুই ট্রামে চড়ে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। সেটা মূলত, ভোরের ময়দানকে ট্রাম থেকে দেখার আশায়। ময়দানের সবুজ ঘাসের মাঝ দিয়ে সাতসকালে ট্রাম ছুটে চলেছে। এ এক অন্য মাদকতা। যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বোঝেন। তখনই শুনেছিলাম, ট্রাম ডিপোতে নাকি সংস্কার চলছে। তাই এখন ট্রাম ধরতে হবে শহিদ মিনার থেকে। তাই সই। শহিদ মিনার থেকেই ট্রাম ধরেছিলাম।

তারপর লকডাউনের চোখরাঙানি। গণপরিবহণে বড় এক ধাক্কা। তখনকার মতো ট্রাম বন্ধ রাখাটা হয়ত স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু তারপর তো এক এক করে সবই স্বাভাবিক হয়ে এল। শুধু ট্রামই নিঃশব্দে চলে গেল বাতিলের খাতায়।

ধর্মতলা–খিদিরপুর রুটে কত বছর ধরে ট্রাম চলে আসছে। তা কি চিরতরে অতীত হয়ে গেল?

বেশ রাগই হচ্ছিল। এই শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ট্রাম। ভারতের আর কোনও শহরে আছে বলে জানা নেই। এই গতির দুনিয়ায় সারা শহরজুড়ে ট্রাম চালানো হয়ত সম্ভব নয়। তাই অনেক ব্যস্ত রাস্তায় স্বাভাবিক নিয়মেই ট্রাম উঠে যাবে। কোথাও হয়ত মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে। আবার কোথাও রাস্তায় যানজট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু খিদিরপুর যাওয়ার রাস্তা তো বিরাট ব্যস্ত রাস্তা নয়। তাহলে, এই রাস্তায় ট্রাম ছুটতে বাধা কোথায়? তাছাড়া, ট্রাম লাইনের অনেকটাই মূল রাস্তার বাইরে। ফলে, যানজট তৈরি হওয়ার বা রাস্তা খারাপ হওয়ার তেমন আশঙ্কাও নেই। অন্তত এই রাস্তায় কি ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখা যেত না?

ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমনটা কেউই বলেন না। বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়, নতুন রূপে ফিরে আসছে ট্রাম। সবকিছু নাকি আরও ঢেলে সাজানো হবে। কিন্তু একের পর এক রুটের ট্রাম কেমন নিঃশব্দে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, অনেক ট্রাম ডিপো নাকি বেসরকারি সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া হয়েছে। এভাবে জমিগুলো জলের দরে বিক্রি আর সেখান থেকে মোটা কাটমানির জন্য ট্রামকে আস্তে আস্তে কবরে পাঠানো হচ্ছে না তো? মাঝে মাঝেই প্রশ্ন জাগে, সরকার আদৌ ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তো!

স্মৃতিটুকু থাক

সেদিন চৈত্রমাস

অন্তরা চৌধুরি

কথায় বলে চৈত্র মাস মধুমাস। অবশ্য এখন এই কথা কাউকে বললে একটা মারও আমার পিঠের বাইরে পড়বে না। কারণ গত কয়েক দিনের তীব্র দাবদাহে চৈত্র মাসকে আর অন্তত মধুমাস বলা যায় না। বরং যা লু বইছে, ধু ধু মাস বলা যেতে পারে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সারা বছর ধরে এই চৈত্র মাসের জন্যই অপেক্ষা করতাম। স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার একটু ফিরে যাই ছোটোবেলায়।

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ছোট ছোট জনপদে শুরু হয়ে যেত শিবের গাজন। আমরা দিন গুনতাম, কবে সেই গাজন দেখতে যাব! মনে আছে, একবার অনেক ছোটবেলায় পিসিমণির শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান জেলার মিঠানীতে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব জাঁকজমক সহকারে চব্বিশ প্রহর হয়। আমার কাছে তখন ‘চব্বিশ প্রহর’ নামটা নতুন ছিল। মানেটাও বুঝতাম না। পরে জানলাম, সারা দিন-রাত ধরে নাম হরি নাম সংকীর্তনকেই চব্বিশ প্রহর বলে। সেই নাম গান এক মিনিটের জন্যও থামবে না। এক দল কীর্তন করে উঠে যেতে না যেতেই আরেকদল কীর্তন শুরু করে দেবে। সেই উপলক্ষ্যে গোটা গ্রাম জুড়ে বিশাল মেলা বসত। গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে অতিথি। খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজন। ওদিকে চৈত্র মাসের শুরুতেই আমাদের বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে শুরু হয়ে যায় ধারার মেলা। সেই শুরু। তার পর এক এক করে এক এক জায়গায় গাজন শুরু হয়ে যায়।

আমি তখন বেশ ছোট। অর্থাৎ বাবা, কাকার সাইকেলে চেপে অনায়াসেই ইতি উতি ঘুরে বেড়াতে পারি। আমার তিন কাকাই আমাকে বড় বেশি ভালোবাসত। এক একজন কাকার এককে রকম বৈশিষ্ঠ্য ছিল। সেই ছোট্ট বয়সে আমি ছিলাম তাদের প্রাণের সঙ্গী। একদিন খবর পেলাম, আমাদের বাড়ির কাছে শালবনীতে গাজন হচ্ছে। বাবুকাকা বলল, ‘চল আজকে তুই আর আমি মেলা দেখতে যাব।’ সন্ধ্যে বেলায় আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি। কিন্তু বাবুকাকার পাত্তা নেই। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য কাকাদের তুলনায় একটু অতিরিক্ত শৌখিন। ঘন্টাখানেক ধরে স্নানটান সেরে বেশ ধোপদুরস্থ জামাকাপড় পরে তাঁর আবির্ভাব হল। এক ঝলক দেখলে মনে হবে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। চুলে শ্যাম্পুর গন্ধ আর বিল ক্রিমের গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। গালটা বেশ চকচক করছে। চুল ফুরফুর করছে।

কম বয়সে বাবুকাকাকে অনেকটা রাজেশ খান্নার মতোই দেখতে ছিল। অসম্ভব ফর্সা, তার সঙ্গে মিশেছে লালচে আভা। তার সাইকেল খানাও পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ সেই সময় রাস্তা দিয়ে গেলে লোকজন বেশ তাকাত। তারপর সন্ধ্যেবেলায় বাবুকাকার সেই পক্ষীরাজে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম শালবনীর গাজনে। সেখানে আমাদের বাড়িতে যে মাছ দিত, সেই নিতাই কাকুর বাড়ি ছিল, সে আমাদের মেলায় দেখতে পেয়ে টানতে টানতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর লুচি, ঘুগনি, পায়েস, মিষ্টি বেশ জম্পেশ করে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

এদিকে, গাজন ততক্ষণে বেশ জমে উঠেছে। চারিদিকেই অজস্র লটারির দোকান। সে বিভিন্ন রকমের লটারি। সবচেয়ে বেশি ডিম লটারি। সাবান লটারি থেকে শুরু করে নারকেল তেল লটারিও রয়েছে। লটারি ব্যাপারটা কী অত ছোট বয়সে আমি ঠিক বুঝতাম না। কিন্তু দেখতে বড় ভালো লাগত। বাবুকাকা অনায়াসে ডিম লটারি খেলতে বসে গেল। তখন ডিম লটারি ছিল কুড়ি পয়সার। দেখি যেখানেই পয়সা দিচ্ছে সেখানেই ডিম পেয়ে যাচ্ছে। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। প্রথম পর্যায়ে প্রায় চল্লিশ খানা ডিম পাওয়া গেছে। আমার তো খুব আনন্দ। আমি বরাবরই ডিম খেতে বড্ড ভালোবাসি। ভাবছি কখন বাড়ি গিয়ে ডিমগুলো সাঁটাব। তার পর শুরু হল বাবুকাকার সাবান লটারি খেলা। তখন বেশ বড় বড় মোতি সাবান ছিল। সেবারে বাবুকাকা প্রায় কুড়িখানা মোতি সাবান আর পাঁচখানা নারকেল তেলের কৌটো জিতল।

কিন্তু লটারি ওরফে ডিম জেতার নেশা কঠিন নেশা। বাবুকাকা আবার ডিম লটারি খেলতে শুরু করল। তারপর বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরলাম। গুণে দেখা গেল মোট সাতষট্টি খানা ডিম পাওয়া গেছে। তখন বাড়িতে অনেক লোক যদিও। সকলেরই বেশ দু তিনখানা করে ভাগে জুটবে। সেই নিয়ে বেশ মজা সকলেরই। এদিকে গোটা দুয়েক নিয়ে খেতে গিয়ে দেখি খোলা ছাড়ানোই যাচ্ছে না। কারণ ভালো করে সেদ্ধ

হয়নি। তখন বাড়িতে গ্যাস ছিল না। কাজেই অত রাত্রিরে আবার অতগুলো ডিমকে মাটির খোলায় সেদ্ধ করে ঠাকুমা রান্না করল। সেদিন বাড়ির সকলে মিলে পরমানন্দে খাওয়া হল ভাত আর লটারি থেকে পাওয়া ডিমের ঝোল।

তার পর থেকে বাবুকাকার সঙ্গে গাজন দেখতে যাওয়াটা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এই সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রামীণ মেলা বা গাজনে একটা অদ্ভুত আনন্দ বা মাদকতা আছে; যা অধুনা কর্পোরেট মেলায় নেই। প্রাণ নেই। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল হাতে ঘোরানো নাগরদোলা। কাঠের তৈরি সেই ছোট্ট নাগরদোলায় চাপতে কী ভালোই না লাগত! যে লোকটা ঘোরাত সে মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করত। আর নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে আনন্দে মেশানো এক অদ্ভুত হাসি আমাদের কিছুতেই থামত না। এখন মনে হয় কত দিন সেই হাসি হাসিনি। তারপর যখন কাকাদের সঙ্গে সাইকেলে চাপার বয়স ফুরোল, তখন মা কাকিমাদের সঙ্গে মেলায় যেতাম। আমি, মা, কাকিমা, ভাই আর কুট্টুস। এই জুটিটা আমাদের দারুণ ছিল।

মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে ধুলোর চোটে মাথার চুল লাল হয়ে যেত। কিন্তু রুমাল দিয়ে নাখ ঢাকার বালাই ছিল না। সেই ধুলো ছিল বড় মিষ্টি। কত বিচিত্র খাবার যে এই সমস্ত মেলায় পাওয়া যেত তার ঠিক নেই। বাবাই গাজনের সময় ভোরবেলায় এক্তেশ্বর যেত। আর সেখান থেকে নিয়ে আসত কুলগুঁড়ো। ওই কুলগুঁড়ো শুধুমাত্র এক্তেশ্বরের গাজনেই পাওয়া যেত। গ্রীষ্ম কালের দিনে নুন, লঙ্কা, তেল দিয়ে ওই কুলগুঁড়ো মেখে ভাত খাওয়ার স্বাদই আলাদা। তবে শুধু কুলগুঁড়ো নয়। আসন্ন বৈশাখের কথা ভেবে তার সাজ সরঞ্জাম ওই চৈত্রের মেলাতেই কিনে নেওয়া হত। যেমন তালপাতার পাখা, মাটির কুঁজো, কলসী, মাদুর, লাটাই, শীতলপাটি ইত্যাদি। তখ-নকার দিনে বড় বেশি লোডশেডিং হতো। তাই সেই গ্রীষ্মের দুপুরে কুজোঁর জল খেয়ে মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে ঠাকুমার কাছে শুয়ে পড়তাম। ঠাকুমা সারা দুপুর তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করত আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত। এখন মনে হয় সে এক রূপকথার জগৎ ছিল।

তারপর এই চৈত্র বৈশাখ মাসে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যে বেলায় হতো হরির লুঠ। তুলসী থানে পুজো করার পর চারিদিকে বাতাসা ছড়ানো হতো। আমাদের সব ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত সেই বাতাসা কুড়োনোর। আর সেই বাতাসাগুলো খেতে কেন যে এত ভালো লাগত বুঝি না। ছোটবেলার সব কিছুই বড় মধুময়, বড় প্রাণময় তাই না!

এখন ফোনে খবর পাই অমুক জায়গায় গাজন হচ্ছে, মেলা বসেছে। ভেতরটা ছটফট করে। কলকাতার এই জনবহুল মহানগরীতে বসেও একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাস আরও আরও প্রগাঢ় হয়। তবে সেই গাজনে যাওয়ার অভ্যেসটা বাবুকাকা আজও বজায় রেখেছে। তবে একা নয়, কুট্টুসকে নিয়ে যায়। সেই ঝাঁ চকচকে সাইকেলটা আর নেই। বাহন এখন মটর বাইক। বাবুকাকাও আগের মতো ঝাঁ চকচকে নেই। সময়ের পলেস্তারা শরীরে পড়লেও মনে অন্তত পড়েনি। তাই আজও বাবুকাকা ডিম লটারি খেলে। সাতষট্টিটা না হোক; অন্তত গোটা দশেক তো আনেই। আর টাইম মেশিনে চেপে আজও বাবুকাকার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা। সে অবাক বিস্ময়ে দু চোখ ভরে দেখে, শুধু দেখে!

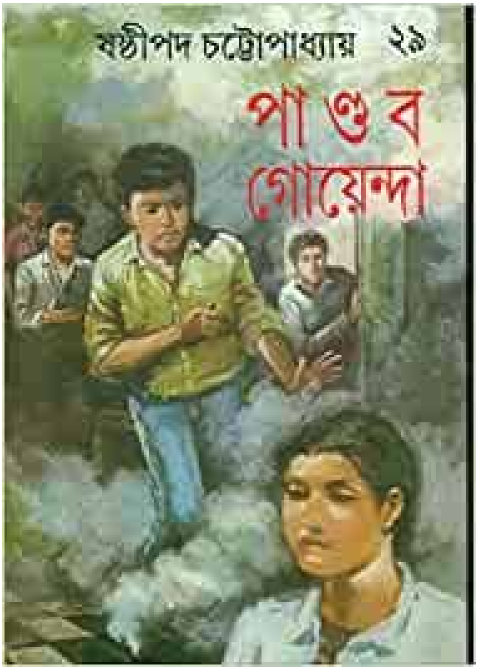

ছোটবেলার সঙ্গী বড়বেলারও সঙ্গী

লেখকের বয়স বাড়ে না। যেমন বয়স বাড়ে না পাণ্ডব গোয়েন্দার। বেঙ্গল টাইমসের তখন পথ চলার শুরু। পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বিশেষ লেখা। লেখকের প্রয়াণে সেই লেখাই আবার ফিরিয়ে আনা হল। লিখেছিলেন সংহিতা বারুই।

কারও বয়স যদি ৭৫ বছর হয়, তবে বলা যেতেই পারে, তিনি বৃদ্ধ হলেন।

কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এমনটা বলা যাবে না। তাঁকে বৃদ্ধ বলার আগে অন্তত দশবার ভাবতে হবে। কারণ, আমরা, যারা তারুণ্যের বড়াই করি, তাদের থেকে তিনি অনেক বেশি পরিশ্রমী। বলা যেতেই পারত, বনস্পতির ছায়া দিলেন সারাজীবন।

কিন্তু তিনি নিজেকে বনস্পতি মনেই করেন না।ছায়ানয়,এখনও রোদে রোদেই ঘোরেন। একা একাই ট্রামে চড়েন, বাসে চড়েন, ঘুরে বেড়ান শহরের অলি গলি পাকস্থলি। ঘোরার গন্ডিটা এখানেই এষ নয়। দেশের নানাপ্রান্তে একা একাই বেরিয়ে পড়েন।

আসলে, এই ৭৫ এও তিনি ছোটদের বন্ধু। ছোটদের মনের কথা আগে যেমন বুঝতেন, এখনও তেমনই বোঝেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। তারা কী পড়াশোনা করছে, কী ভাবছে, কী ভাষায় কথা বলছে, বোঝার চেষ্টা করেন।

আমাদের অনেকেরই ছোটবেলা কেটেছে তাঁর বই পড়ে। বয়স বাড়লেও নেই নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। এখনও পাড়ায় কুকুর দেখলে মনে পড়ে যায় পঞ্চুর কথা। বাবলু, ভোম্বল, বিলু, বাচ্চু, বিচ্চুরা আমাদের খুব একটা অচেআ নয়। আমি পড়েছি। আমার বাবার ছোটবেলাটাও তাঁর লেখা পড়েই কেটেছে। প্রিয় পাঠক, আর কোনও ক্লু না দিলেও

চলবে। তিনি পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। তিনটে প্রজন্মের ছোট বেলার বন্ধু। নিজের অজান্তেই তাঁর চরিত্রগুলোর সঙ্গে কখন যে মিশে গেছি! কেউ কেউ বাড়িতে কুকুরের নাম রেখেছি পঞ্চু। বাংলায় পঞ্চু নামের কুকুরের সংখ্যা কত ? আদমসুমারি, বাঘসুমারি, গন্ডার সুমারির কথা শুনেছি। কু-কুর-সুমারি হয় কিনা, জানি না। হলেও কার নাম কী, এমন তথ্য আছে কিনা তাও জানি না। তবে নানা সময় মিলিয়ে পঞ্চু নামে কুকুরের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই হাজার ছাড়িয়ে যাবে। অথচ, পাণ্ডব গোয়েন্দা হয়ত লেখাই হত না, যদি পঞ্চু না থাকত।

না, পঞ্চু কোনও কাল্পনিক চরিত্র নয়। লেখকের অতি আপনজন। তাঁর দেশের বাড়িতে এই নামে একটা কুকুর ছিল। তিনি দেশের বাড়িতে গেলে পায়ে পায়েই ঘুরত পঞ্চু। কোনও এক আত্মীয় ঢিল মেরেছিলেন পঞ্চুকে। সেই থেকেই একটা চোখে দেখতে পেত না পঞ্চু। ষষ্ঠী-পদ ফিরে আসবেন হাওড়ার বাড়িতে। কিছু পিছু আসছে পঞ্চু। কিছুতেই পেছন ছাড়ছে না। ট্রেনেও উঠে পড়ল। তাকে নিয়েই তরুণ ষষ্ঠীপদ পৌঁছে গেলেন হাওড়া স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরোতেই অন্য কুকুররা ঘিরে ধরল পঞ্চুকে। তাদের হাত থেকে বাঁচাতে তখন পঞ্চুকে কোলে নিয়ে রিক্সায় উঠলেন। নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। সেই থেকে পঞ্চুও পরিবারেরই একজন। মাঝে মাঝেই যেতেন দা-শনগরে, সঙ্গী সেই পঞ্চু। কখনও মার্টিল রেল, কখনও আমতা, কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেন। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি ঘুরে বেড়াল পঞ্চুও।

ষষ্ঠীবাবুর বয়স তখন কুড়ি। তার আগে থেকেই লেখালেখি করতেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তখন শুকতারার সম্পাদক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার। একদিন বললেন, ‘রোজ তোমার পঞ্চুর অনেক গল্প শুনি। তাকে হিরো করে একটা গোয়েন্দা গল্প লেখো।’ কিন্তু শুধু পঞ্চুকে নিয়ে তো গল্প দাঁড়াবে না। এসে গেল বাবলু, ভোম্বল, বিলু, বাচ্চু, বিচ্চু। এরাও কাল্পনিক চরিত্র নয়। যাদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন, মিশতেন, তাদের জীবন থেকেই নেওয়া চরিত্রগুলো। নামগুলো একবার লক্ষ্য করুন। সব নাম ‘বি’ দিয়ে শুরু। বাংলায় বললে ব আর ভ। বাচ্চু আর বিচ্চু কিন্তু মহিলা। ভেবে দেখুন ছয়ের দশকে দুই মহিলা গোয়েন্দা! তারা যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারে। সমকালের থেকে ভাবনা কতটা এগিয়ে ছিল।

সেই শুরু। একের পর এক সিরিজ চলতেই লাগল। বাঙালির পুজোর অনিবার্য সঙ্গী হয়ে উঠল ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’। কেটে গেল অর্ধ শতাব্দী। কুকুর দেখলেই তাদের নাম রাখা হল পঞ্চু। এখন যখন রাস্তায় যেতে যেতে দেখেন কোনও কুকুরের নাম পঞ্চু, কী মনে হয় ? বেশ তৃপ্তির হাসি দেখা গেল লেখকের মুখে, ‘তখন সত্যিই খুব আনন্দ হয়। এই ছোট ছোট স্বীকৃ-তিগুলোই তো একজন লেখকের সম্বল। এই ছোট ছোট অনুভূতিগুলো মনকে ছুঁয়ে যায়।’

নিছক গোয়েন্দা গল্প নয়, পাণ্ডব গোয়েন্দা এক-সঙ্গে আরও অনেককিছু। বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাসের গল্প। একসঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ার গল্প। নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন রহস্যের সমাধান। পড়তে পড়তে সেই জা-য়গাটাও ঘোরা হয়ে যেত। এভাবেই কত অজানার কথা জেনে নিয়েছি নিজেদের অজান্তে।

লেখক নিজেও বেড়াতে খুব ভালবাসেন। এই বয়সেও বছরে অন্তত তিন-চার বার লম্বা ট্যুরে ঠিক বেরিয়ে পড়বেন। একসময় ঠাকুমা থাকতেন হরিদ্বারে। তাঁকে দেখতে মাঝে মাঝেই চলে যেতেন। সেই অভ্যেসটা এখনও ছাড়তে পারেননি। বছরে একবার না একবার তাঁকে
হরিদ্বার যেতেই হবে। প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন থেকে আসেন। কোনও সঙ্গীর পরোয়া করেন না। একা একাই বেরিয়ে পড়েন। নিজের মনেই এখান ওখান ঘুরে বেড়ান। সেই মনোরম পরিবেশে আস্ত উপন্যাসও লিখে ফেলেন। জীবনে অনেক লেখা বেড়াতে গিয়েই লিখে ফেলেছেন। পাণ্ডব গোয়েন্দার পাশাপাশি লিখে গেছেন ভূতের গল্প। লিখেছেন অজস্র ভ্রমণ কাহিনী। ইদানীং ভূতের গল্প বিশেষ লিখছেন না। তবে ভ্রমণ কাহিনী লেখার জন্য দেশের
নানাপ্রান্তে চষে বেড়ান। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন মানুষ খুঁজে বেড়ানো। এই বয়সেও শখ বা নেশা বলতে এই বেড়ানোই।

বাড়িতে স্ত্রী। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। নিজেই থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাজার করতে। গাছপালা ভালবাসেন। পশুপাখিদের প্রতি টান এই ছোটবেলা থেকে। টিভি দেখেন না বললেই চলে। রাজনীতিতে কোনও আগ্রহ নেই। ঘরে থাকলে সারাদিন লেখালেখি নিয়েই কেটে যায়। নতুন নতুন ভাবনা ঘুরপাক খেতে থাকে। কখনও বেড়িয়ে আসার গল্প লিখতে বসেন। আবার কখনও অনেক তথ্য জোগাড় করে রাখেন, বেড়াতে গিয়ে সেগুলো লিখে ফেলেন।

মাঝে শোনা গিয়েছিল, পাণ্ডব গোয়েন্দা নিয়ে নাকি সিনেমা হবে। পরিচালক মৈনাক ভৌমিক আর প্রযোজক রানা সরকার লেখকের বাড়িতেও এসেছিলেন। চুক্তি হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে অভিনেতা বাছাইও হয়েছিল। নানা কারণে, সেই কাজ আটকে আছে। লেখকের দাবি ছিল, ছবির প্রয়োজনে গল্পে টুকটাক পরিবর্তন করা যেতেই পারে। কিন্তু তা গল্পের মূলস্রোত থেকে যেন কখনও সরে না যায়। মেনে নিয়েছিলেন পরিচালক। বলেছিলেন, 'গল্পের কোনও নড়চড় হবে না।' সময়ের দাবিতে বাবলুরা যদি মোবাইল ব্যবহার করে, আপত্তি নেই লেখকের। কিন্তু তাদের বয়স যেন উনিশ, কুড়ির মধ্যে হয়, এমন-টাও জানিয়ে দিয়েছেন। তবে সিনেমা নিয়ে তাঁর খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। তাঁর কথায়, 'সিনেমা হলে কিছু লোক দেখবে ঠিকই। তবে যাদের পড়ার অভ্যেস, তাদের সিনেমা দেখে ঠিক তৃপ্তি হবে না। আমি নিজে সিনেমা নিয়ে তেমন আগ্রহী নই। আমার লিখতেই ভাল লাগে। লেখা নিয়েই থাকতে চাই।'

লেখা নিয়েই আছেন। দিব্যি আছেন। সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর মতো। প্রবীণ হয়েও নবীনের মতো।

শ্রদ্ধায় স্মরণে

কর্মাটাঁড়ের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার

শাক্য সেন

মংপুতে তিনবার গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। থাকতেন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। বাড়িতে না বলে কোয়ার্টারে বলাই ভাল। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী চাকরি করতেন কুইনাইন ফ্যাক্টরিতে। তাঁর বাংলোতেই অতিথি হয়ে উঠতেন বিশ্বকবি। তখন জীবনের প্রান্তবেলা। ঘুরে বেড়ানোর তেমন সামর্থ্য নেই। পাহাড়ি সেই জনপদে বাঙালি প্রায় ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশই নেপালি। ফলে, রবীন্দ্রনাথ কী লেখেন, সেসব বোঝা তাঁদের কম্ম নয়। তবু সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড় লেগে যেত। আসলে, কবির কাছে নয়, তাঁরা আসতেন ডাক্তারের কাছে। এখানে রবি ঠাকুরের পরিচিতি ছিল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে। তিনি এই পাহাড়ি মানুষদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, ওষুধ দিতেন।

বিশ্বকবির সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী বিদ্যাসাগরের এই ব্যাপারটায় খুব মিল। তিনিও শেষ জীবনে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারই হয়ে উঠেছিলেন। সেটাও কলকাতা থেকে অনেক দূরে, কর্মাটাঁড়ে। সেই কর্মাটাঁড় দীর্ঘদিন ছিল বিহারে। রাজ্য ভাগের পর তা এখন ঝাড়খণ্ডে। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সতেরোটা বছর কেটেছে এই আদিবাসী অধ্যুসিত গ্রামে। আর এখানে তিনি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়। কিংবদন্তি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক হিসেবেও খ্যাত) বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিদ্যাসাগরও সরকার মশাইকে নানা সেবামূলক কাজে টাকা তুলে দিতেন।

সেইসঙ্গে বিদেশি বই পড়ে টুকটাক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও আয়ত্ব করেছিলেন। যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল সেই কর্মাটাঁড়ে।

হঠাৎ কর্মাটাঁড়ে গেলেনই বা কেন? বলা যায়, নিজের গ্রাম আর কলকাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। বিদ্যাসাগর বলতেই উঠে আসে তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, এই বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন ইশ্বরচন্দ্র। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই গ্রামে আর কখনও ফিরবেন না। সেই প্রতিজ্ঞার পরেও তিনি আরও ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কখনই নিজের গ্রামে পা রাখেননি। কলকাতা সম্পর্কেও একইরকম বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যেভাবে কটাক্ষ, বিদ্রুপ ও পদে পদে বাধা পেয়েছেন, তা তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। অনেকেই জানেন, বিদ্যাসাগর নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গেও একসময় সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭২ সাল নাগাদ ছেলেকে তাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। স্ত্রীও মারা গেলেন। অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় কিছুতেই আর মন টিকছিল না। এদিকে, গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন। ঠিক করলেন, বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে একেবারে কোনও প্রান্তিক গ্রামে গিয়ে থাকবেন।

প্রথমে ঠিক ছিল, তিনি দেওঘরে থাকবেন। একটি বাড়িও দেখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু বাড়িওয়ালা এমন দাম হাঁকলেন, তিনি পিছিয়ে গেলেন। শেষমেষ বেছে নিলেন দেওঘর থেকে কিছুটা দূরে, কর্মাটাঁড়। আদিবাসী ভাষায় টাঁড় মানে, উঁচু জমি, যেখানে জল দাঁড়ায় না। আর কর্মা নামে এক মাঝি ছিলেন। মোদ্দা কথা, কর্মা মাঝির উঁচু জমি। সেখানে এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে

এখানেই ডাক্তারি শেষ নয়। বিকেল দিকে বাড়ি বাড়ি গিয়েও চলত ডাক্তারি। আর সন্ধের পর গ্রামের বয়স্কদের নিয়ে স্কুল। এভাবেই দিন কেটে যেত। এই আদিবাসীদের সান্নিধ্য বেশ ভালই লাগত বিদ্যাসাগরের। এ নিছক কয়েক মাসের সমাজসেবা নয়। শেষ জীবনের সতেরোটা বছর এভাবেই কেটেছে। ভাবা যায়, বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ কিনা শেষ সতেরোটা বছর (১৮৭৩—১৮৯০) কাটিয়ে ছিলেন একেবারে আদিবাসীদের গ্রামে!

১৪ বিঘা জমি কিনেছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি সেই জমি বিক্রি করে দেন। কিনে নিলেন বিদ্যাসাগর। তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল ৫০০ টাকা। সেই জমিতে নিজে একটি বাড়ি তৈরি করলেন। নাম দিলেন নন্দনকানন। একটি শোবার ঘর, একটি পড়াশোনার ঘর। আরেকটি বড় হল ঘর। সেখানে রাতে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাতেন।

কর্মাটাঁড়ে এসেই বিদ্যাসাগর বুঝলেন, এত বড় এলাকায় কোনও ডাক্তার নেই। এখানে লেখাপড়া শেখানোর চেয়েও চিকিৎসা বেশি জরুরি। তাই সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ডাক্তারখানা। মোটামুটি সকাল দশটা পর্যন্ত চলত এই পর্ব। ভিজিট নেওয়া তো দূরের কথা। ওষুধও নিজেই বানিয়ে দিতেন। সেই সঙ্গে কোনও কোনও রোগীর পথ্যও তৈরি করে দিতে হত। সাগু, বাতাসা, মিছরি নিয়েই বসতে হত।

মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন ঠিকই। সেটা মূলত চিকিৎসার কাজে। তাও অল্প দিনের জন্য। ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতেন ওষুধ, ফল, জামাকাপড়। বিদ্যাসাগর কর্মাটাঁড়ে ফিরলেন মানেই গ্রামর মানুষের প্রত্যাশার শেষ নেই, ‘এই বিদ্যেসাগর, কী এনেছিস?’ পুজোর আগে গ্রামের প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেতেন। কারও জন্য শাড়ি, কারও জন্য লুঙ্গি, কারও জন্য জামা। শেষ একটা বছর অবশ্য খুবই অসুস্থ ছিলেন। ফিরে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। সেখানেই মৃত্যু (১৮৯১)। যে পুত্রকে তাজ্যপুত্র করেছিলেন, সেই নায়াণচন্দ্র এবার

কর্মাটাঁড়ে এলেন সম্পত্তির দখল নিতে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, সম্পত্তি বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সেটাই তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন। বিক্রি করলেন কলকাতার মল্লিক পরিবারকে। সেই পরিবারও জায়গাটা নিয়ে ফেলেই রাখল।

অনেক পরে এগিয়ে এল বিহার বাঙালি সমিতি। স্বাধীনতার আগেই তাঁরা মল্লিক পরিবারের কাছ থেকে সেই জমি ও বাড়ি কিনে নিলেন। চালু করলেন একটি মেয়েদের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৯৭৮ সাল নাগাদ মূলত তাঁদের দাবিতেই কর্মাটাঁড় স্টেশনের নাম হয়ে গেল বিদ্যাসাগর। গত বছর ঝাড়খণ্ড সরকার ঘোষণা করেছে পুরো কর্মাটাঁড় থানা ও ব্লকও বিদ্যাসাগরের নামে হয়ে যাবে। সেই বাড়ি, সেই স্কুল আজও আছে। আজও আছে বিদ্যাসাগরের লাগানো সেই আমগাছ। পাশে তৈরি হয়েছে গেস্ট হাউস।

ইতিহাস বিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালির বিশেষ একটা ‘সুনাম’ আছে। ইতিহাস তাঁর ভেতর রোমাঞ্চ আনে না। তাঁকে শিহরিত করে না। তাই বছরভর বাঙালি এত এত জায়গায় বেড়াতে যায়, তাঁদের কজনই বা আসেন এই কর্মাটাঁড়ে! আপনার পরিচিত একশো জনের মধ্যে খোঁজ নিন। দেখুন, একজনও সেখানে যাননি। একশো জনের মধ্যে অন্তত আঠানব্বই জন ‘কর্মাটাঁড়’ নামটাই শোনেননি।

যেখানে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সতেরোটা বছর কাটিয়েছিলেন, সেখানে বাঙালি একদিনের জন্যও যেতে পারে না! ২০০ বছরের জন্মদিনে আমরা ফেসবুকে ছবির বন্যা বইয়ে দিই। কিন্তু একটা ছুটির দিন দেখে একটু কর্মাটাঁড় ঘুরে আসা যায় না!

১৬ বছরে লিখেছিলেন দাদার কীর্তি!

রুদ্র ভৌমিক

তাঁর কাহিনী নিয়ে একের পর এক ছবি তৈরি হয়েছে। মুম্বইয়ে নিজেও লিখেছেন একের পর এক চিত্রনাট্য। সেগুলো থেকে সেই সময়ের হিট হিন্দি ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু নিজের ১৬ বছর বয়সে লেখা গল্প নিয়ে ছবি হতে পারে, কখনই ভাবেননি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখনও ব্যোমকেশের ভাবনা মাথাতেই আসেনি। আর ঐতিহাসিক উপন্যাস! সেগুলোও জন্ম নেয়নি। কলেজ জীবন থেকেই টুকটাক লেখালেখি। ওই ষোল বছর বয়সেই লিখেছিলেন প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তখন বয়স অল্প। তাই সেই সময় প্রেমের গল্পটি কোথাও ছাপতে দেননি। পাছে বয়স্করা দেখে ফেলে!

পরে একের পর এক গল্প, উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বম্বেতে চিত্রনাট্যকার হিসেবেও বেশ খ্যাতি। কিন্তু ষোল বছর বয়সের ওই গল্পটা কোথাও কখনও ছাপতে দেননি। মনে হয়েছিল, ওটা নেহাতই কাঁচা হাতের লেখা। যে লোকটা ব্যোমকেশ লেখে, সেই লোকটার নামে এই লেখা মানাবে না। এভাবেই লেখাটা পড়ে রইল ড্রয়ারের মধ্যেই।

সামনে এল তাঁর মৃত্যুর পর। ১৯৭০ সালে পুনেতে থাকাকালীন হল সেরিব্রাল অ্যাটাক। আনা হল বম্বেতে। সেখানেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর এই অপ্রকাশিত গল্পটি প্রকাশ পেল। যেটি সারাজীবন কাঁচা হাতের লেখা বলে কোথাও ছাপতে দিলেন না, সেটি প্রকাশ হতেই অন্য মোড় নিল। এগিয়ে এলেন তরুণ মজুমদার। ঠিক করলেন, এই গল্পটা নিয়েই সিনেমা বানাবেন। বললেন, এই গল্পের চিত্রসত্ব চাই। একটু একটু দাঁড় করালেন গল্পটাকে। তৈরি হল চিত্রনাট্য। গল্পের নামটা বদলে গেল। সেই ছবিই হয়ে উঠল 'দাদার কীর্তি'।

অবাঙালিদের কড়া বার্তা দেওয়ার সময় এসেছে

OPEN FORUM

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

বাঙালি যেন নিজভূমে পরবাসী। নিজের রাজ্য। সেখানে সে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে না। জেলার দিকে, গ্রামের দিকে যদিও বাংলা বেঁচে আছে, শহর কলকাতা থেকে বাংলা একেবারেই যেন নির্বাসিত। শুধু ইংলিশ মিডিয়ামকে দোষারোপ করে লাভ নেই। রাস্তায়, দোকানে, ট্যাক্সিতে কতটুকু বাংলা শুনতে পাই?

সবাই এখানে হিন্দিতে কথা বলতেই অভ্যস্থ। এমনকী বাঙালিরাও সেই স্রোতেই গা ভাসিয়েছে। বাংলা না বলাটাই যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন আপনার মোবাইলে বিভিন্ন কোম্পানির ফোন আসে। বেশিরভাগই হিন্দিতে। এমন নয় যে তাঁরা দিল্লি বা মুম্বই থেকে করছেন। এই কলকাতার অফিস থেকেই ফোন আসছে। কিন্তু টেলিকলার বাংলা জানে না। বা জানলেও বলবে না।

ট্যাক্সিতে উঠুন। এখানে তো আরও ভয়ঙ্কর। বাঙালি ড্রাইভার কমতে কমতে প্রান্তিক হয়ে এসেছে। যদিও বা কয়েকজন আছেন, তাঁরাও শুরুই করেন হিন্দি দিয়ে। উত্তর কলকাতায় তবু কিছুটা বাংলা পাবেন। দক্ষিণ কলকাতার বিশেষ কিছু জায়গায় হয়ত পাবেন। বাকি অংশে বাংলা কোথায়? অধিকাংশ দোকানেই আপনাকে হিন্দি শোনার জন্য তৈরি থাকতে হবে। অবাঙালিদের আমরা বাংলা শেখানোর তাগিদই অনুভব করিনি। এই তালিকায় মুসলিমরা যেমন আছেন, তেমনি মারওয়াড়ি, গুজরাটি, বিহারীরাও আছেন। পার্ক সার্কাস, তপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, রাজাবাজারে আপনি বাংলা শুনতে পাবেন না। ঠিক তেমনি বড়বাজারে গেলেও পাবেন না। মনে হবে, দোষটা তাদের নয়, আপনার। কারণ আপনি বাংলা জানেন। আপনাকেই তাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে হবে।

যাঁরা কয়েকমাসের জন্য এসেছেন, তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু যাঁরা বহু বছর ধরে এখানে আছেন, যাঁদের এখানেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাঁরাও বাংলায় কথা বলেন না। বরং আমরা আদিখ্যেতা করে তাঁদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলি। অনেক হয়েছে। এবার এটা বন্ধ হওয়া দরকার। একটা কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার।

আহারে বাহারে
মনোভাব সহ খাদ্য

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি

দিব্যেন্দু দে

একেবারেই সাম্প্রতিক একটি ওয়েব সিরিজ— রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি। পূর্ববঙ্গের একটি হোটেলের পটভূমি। সেই ভাতের হোটেলকে ঘিরে নানা ওঠা-পড়া। কিন্তু নামকরণেই রয়েছে অদ্ভুত এক চমক।

তেমনই একটি হোটেলের কথা। রানাঘাটের আদর্শ হিন্দু হোটেল। রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েই চোখে পড়বে এই হোটেলটি। মনে পড়ে যাবে বিভূতিভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই রানাঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি ভাতের হোটেলকে নিয়ে লেখা তাঁর কালজয়ী উপন্যাস— আদর্শ হিন্দু হোটেল। সেই হাজারি ঠাকুর। সেই পদ্ম ঝি। আরও কত চরিত্র। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আটের দশকের শেষদিকে চমৎকার একটা সিরিয়ালও হয়েছিল। মনোজ

মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির সেই অভিনয়ের কথা এখনও মুখে মুখে ফেরে।

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল এই হোটেলে একদিন খাওয়ার। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, একদিন সুযোগটা এসেই গেল। গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর। ফেরার পথে কী মনে হল, নেমে পড়লাম রানাঘাটে। অন্য কোনও কারণে নয়। স্রেফ ওই হোটেলে একদিন খাব বলেই। এই হোটেলকে নিয়ে এমন কালজয়ী উপন্যাস! মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিহরণ কাজ করছিল। দোকানে বেশ ভিড় ছিল। ফলে, শুরুতে মালিকের সঙ্গে বা কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার তেমন সুযোগ ছিল না। এত খদ্দেরের ভিড়ে দোকানের ইতিহাসের কথা বলতে হলে তাঁরা হয়ত বিরক্তই হতেন। সত্যিই তো, একই ইতিহাস কতবারই বা বলবেন!

নীচে এখন একটা মিষ্টির দোকান। নাম আদর্শ সুইটস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয় দো’তলায়। বেশ ছিমছাম, সাজানো। বিভূতিবাবুর ছবি টাঙানো। এখান থেকে স্টেশন দেখা যায়। ট্রেনের আসা –যাওয়াও দেখা যায়। বিভূতিবাবুর ভাবনায় নিশ্চয় এমন দোতলা ছিল না। সেখানে ছিল দরমার বেড়া। খড়ের ছাউনি। কলাপাতা। স্টেশন থেকে খদ্দের ডেকে আনতে হত। হাজারি ঠাকুরের রান্নার এমনই সুখ্যাতি, খদ্দেররা ঠিক ভিড় জমাত।

কিন্তু যা হয়! লোকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যা। এমনকী চুরির অপবাদও মাথায় নিতে হল। হাজারি ঠাকুরের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নিজের একটা হোটেল তৈরি করবেন। সেখানে নিজের হাতে রান্না করে খদ্দেরদের খাওয়াবেন। কোনও খদ্দেরকে ঠকাবেন না। কিন্তু তাঁর সেই সামর্থ্য কই? এদিক-ওদিক থেকে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। স্টেশনের গায়েই তৈরি হল আদর্শ হিন্দু হোটেল। মালিক হওয়া সত্ত্বেও ক্যাশবাক্স নয়, তাঁর ঠিকানা সেই রান্নাঘর।

আমি কোনওকালেই রাঁধুনি নই। চা, চাউমিন, কাজ চালানো খিচুড়ি, ডিম ভাজা— এই আমার রান্নার দৌড়। বেশি সময়ও নেই, সেই নিষ্ঠাও নেই। কিন্তু নিজের কাজটা বরাবরই যত্ন নিয়ে করি। তাই হাজারি ঠাকুরের সঙ্গে নিজের কোথায় একটা মিল পেতাম। সেই কারণেই হয়ত এই উপন্যাসটা আমার এত প্রিয়। সেই কারণেই রানাঘাটের এই হোটেলে একদিন

ভাত খাওয়ার এমন তীব্র ইচ্ছে।

দোকানে একইসঙ্গে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেল। দিনের বেলায় এখনও সেই সাবেকি ভাতের হোটেল। কলাপাতা নেই, তবে কাগজের প্লেটে কলাপাতার আদল আছে। ভাত, ডাল, নানা রকমের তরকারি, ভাজাভুজি। পাঁঠার মাংস। সঙ্গে নানা রকমের মাছ। তবে সন্ধের পর চেহারা অন্য-রকম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তখন মোগলাই, চাইনিজের হরেক আয়োজন। দাম যে খুব বেশি, তাও নয়। মোটামুটি অন্যান্য রেস্তোরাঁর মতোই।

আচ্ছা, হাজারি ঠাকুর থাকলেও কি আজ এভাবেই চাইনিজ, মোগলাই করতেন? হয়ত করতেন। কারণ, উপন্যাস পড়ে যেটুকু মনে হয়েছে, তিনি সময়ের দাবি বুঝতেন। খদ্দেরের চাহিদা ও তৃপ্তির কথা বুঝতেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই ভালবাসতেন। তাই তিনিও হয়ত চাইনিজ, মোগলাই আয়ত্ব করে নিতেন। ভাত, ডাল, মুড়ি ঘণ্টের সঙ্গে যখন সর্ষে ইলিশ দিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল ভেতরে বোধ হয় সেই হাজারি চক্কোত্তি মশাই রান্না করছেন।

না, বিভূতিবাবুর সময় সত্যিই এই হোটেল ছিল না। তবে এই বাড়ির সঙ্গে

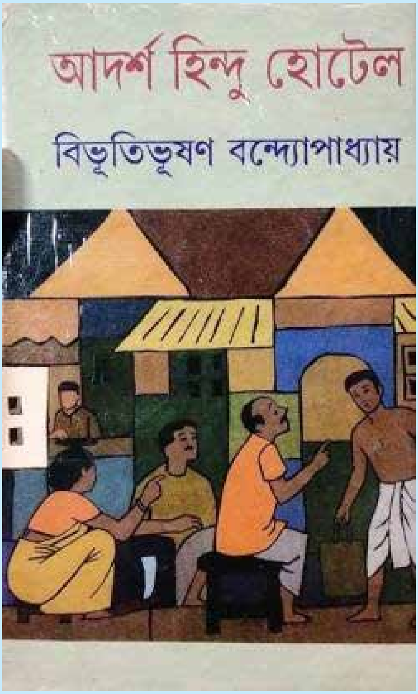

তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এটা ছিল তাঁর মাসির বাড়ি। মাঝে মাঝেই পথের পাঁচালির স্রষ্টা এই বাড়িতে আসতেন। থাকতেন। কখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে লোকজনের আসা যাওয়া দেখতেন। আবার কখনও হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন চূর্ণী নদীর দিকে। আশপাশের কিছু হোটেল হয়ত দেখেওছিলেন। মনে মনে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই কালজয়ী উন্যাস।

এই দোকানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই গোপীনাথ কুণ্ডু অবশ্য প্রথমে উপন্যাস

পড়েননি। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর এই উপন্যাস নিয়ে একটি নাটক হয়েছিল। কলকাতায় একবার সেই নাটকটি দেখেন। তখনই নামটি মাথায় গেঁথে যায়— আদর্শ হিন্দু হোটেল। এখন যেখানে, সেখানে নয়, এখান থেকে একটু দূরে। তখন ছিল মাটিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পরে বিভূতি বাবুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটা কিনে নিলেন। এখানেই উঠে এল আদর্শ হিন্দু হোটেল। অনেকেই ভাবতেন, এই হোটেলেই হয়ত বিভূতিভষণ খেতেন। বা এই হোটেলকে ঘিরেই তিনি হয়ত ওই উপন্যাস খানা লিখেছেন। কিন্তু আসল সত্যিটা হল, উপন্যাসটা লেখার পর, বিশেষত সেটা নাটক হওয়ার পর, এই নামের হোটেলটি তৈরি হয়। পরে আটের দশকে এই কাহিনী নিয়ে

জনপ্রিয় সিরিয়াল হয়। ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় আদর্শ হিন্দু হোটেলের কথা।

আশপাশের অনেকেই তখন এখানে খেতে আসতেন। যেমন এখনও আসেন। আর যেহেতু বাইরে থেকে এত খদ্দের স্রেফ এই নামটার জন্যই আসে, তাই মানটাও ধরে রাখতে হয়েছে। হাজারি চক্কোত্তির মতো না হোক, অন্তত ভাল মানের রাঁধুনি রাখতে হয়েছে। তাই ভাত –ডালের হোটেলে সীমাবদ্ধ না থেকে চাইনিজ–মোগলাইয়ের আমদানি করতে হয়েছে।

গোপীনাথবাবু নেই। তাঁর ছেলে অমরনাথ কুণ্ডু এখন ক্যাশবাক্সে বসেন। চাইলে একটু জল মেশাতেই পারতেন। বলতেই পারতেন, এখানে বিভূতিভূষণ খেতেন। কিন্তু তিনি সত্যিটাই বলেন। তিনি অকপটেই বলেন, 'বিভূতিবাবু এই হোটেল দেখে যাননি। তখন এই হোটেল ছিলও না। তাঁর এই উপন্যাসের নাম অনুসারে আমার বাবা এই হোটেল তৈরি করেন।' চারিদিকে যখন বাড়িয়ে বলার হিড়িক, তখন ষাট বছরে একটু জল মেশাতেই পারতেন। কোথাও একটা সংযম ধরে রেখেছেন। জানেন, কতটুকু বলতে হয়। কোনটা বলতে নেই। এই সংযমটা কজনের থাকে!

বিভূতিভূষণ আসুন আর নাই আসুন, এই নামটার একটা বাড়তি আকর্ষণ তো আছেই। এই বাংলায় এমন নামের হোটেলের অভাব নেই। সব জেলাতেই পাবেন। কিন্তু রানাঘাট স্টেশনের বাইরেই। সেই বাড়িতেই। আশপাশের অনেক ছবিও দিব্যি মিলে যায়। সাহিত্যের একটা গন্ধ তো আছেই। আমিও তো গিয়েছিলাম সেই গন্ধের টানেই।

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

খোলা চিঠি

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি বিভাগ— খোলা চিঠি। একটা সময় নিয়মিত প্রকাশিত হত। নানা জগতের দিকপালদের লেখা হত এই খোলা চিঠি। কোনওটা অভিনন্দনের, কোনওটা তীব্র সমালোচনার। লিখতেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পাঠকরা।

মাঝে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। ই ম্যাগাজিনে আবার সেই খোলা চিঠিকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। চেষ্টা থাকবে প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি করে খোলা চিঠি প্রকাশ করার। এই চিঠি মূলত সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যুকে নিয়েই। রাজনীতি, সাহিত্য, খেলা, বিনোদন-সহ যে কোনও জগতের মানুষকেই লেখা যেতে পারে এই খোলা চিঠি। লিখবেন আপনারা।

লেখার শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ৫০০ থেকে ৮০০।

পিডিএফ নয়, ইউনিকোডে পাঠান।

নির্বাচিত কিছু চিঠি নিয়ে আলাদা সংখ্যাও হতে পারে।

লিখে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

মিডিয়া সমাচার

এক মিডিয়ার কথা অন্য মিডিয়ায় সচরাচর আলোচনা হয় না। কিন্তু বেঙ্গল টাইমসে বেশ কয়েকবছর ধরেই মিডিয়া জগতের নানা অজানা দিক উঠে আসে।

একজন অভিনেতা বা খেলোয়াড় বা সাহিত্যিক যদি পারফর্মার হয়ে থাকেন, তবে একজন সাংবাদিকও পারফর্মার। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও ক্লাব নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তাহলে কাগজ বা চ্যানেলও একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের নিয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রাণ খুলে প্রশংসাও করতে পারেন। আবার ভাল না লাগলে সমালোচনাও করতে পারেন।

মিডিয়া মানে এখন আর শুধু কাগজ বা টিভি চ্যানেল নয়। গণমাধ্যমের সুবিশাল পরিসরে সোশ্যাল মিডিয়াও ঢুকে পড়েছে।

কোনও চ্যানেলের দারুণ কোনও অনুষ্ঠান নিয়ে আলোকতপাত হতে পারে। কোনও ভাল ইউটিউব চ্যানেল ও তার কনটেন্ট নিয়েও আলোকপাত হতে পারে। ফেসবুকের কোনও ভাল গ্রুপ নিয়েও চর্চা চলতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে ভাগ করে নিতেই পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

পুরীর আড়ালে অন্য পুরী

সুমিত চক্রবর্তী

বাঙালির পুরী যাওয়া নিয়ে একটা কথা খুব চালু আছে। সে পাঁচ-ছদিন থাকে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ধবলগিরি, কোনারক, চিল্কা, নন্দনকানন— যা যা আশেপাশে আছে, সব দেখে ফেলে। শুধু পুরীটা দেখাই বাকি থেকে যায়। সকালে বেরিয়ে পড়া। বিস্তর ঘুরে, ছবি-টবি তুলে সন্ধে নাগাদ ফিরে আসা। তারপর কেউ ডুবে যায় গ্লাসে। আবার কেউ বা টিভির পর্দায় মন সঁপে দেয় সিরিয়ালে। বড়জোর ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধেতে একটু বিচে গিয়ে বসা। এসব করতে গিয়ে পুরীটাই আর দেখা হয় না।

আমি একেবারেই উল্টো পাবলিক। আমি যতবার যাই, পুরীতেই থাকি। আশপাশের অনেককিছুই তাই না দেখাই থেকে গেছে। বেঙ্গল টাইমসে ভ্রমণের টুকরো টুকরো বিষয় উঠে আসছে। মনে হল, পুরীর ফরেনার ঘাট নিয়ে নিজের অনুভূতি তুলে ধরা যাক। প্রথমবার গিয়েছিলাম বছর দশেক আগে। তারপর গেছি আরও তিনবার।

প্রথম হদিশ দিয়েছিল এক অটোওয়ালা। জানতে চেয়েছিলাম, এখানে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। সে বেশ কয়েকটা জায়গার কথা বলেছিল। সেসব জায়গায় ঘোরানোর পর বলল, আরও একটা ভাল জায়গা আছে, যাবেন? তবে, সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হবে। আপনাদের নামিয়ে আমি চলে যাব। পরে ফোন করে দেবেন। আমি এসে নিয়ে যাব। নইলে সমুদ্রের পাড় ধরে হেঁটেও চলে যেতে পারেন।

সে আমাদের ফরেনার ঘাটে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। মনে হচ্ছিল না, ওটা পুরী। মনে হচ্ছে, যেন গোয়ার সি বিচ বা বিদেশে কোথাও বসে আছি। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিদেশিরা। শীতের রোদ গায়ে মেখে ওরা সমুদ্রের পাড়ে। কে কোন দেশ থেকে এসেছে, বোঝা মুশকিল। কেউ আপন মনে বই পড়ছে। কেউ ল্যাপটপ নিয়ে লিখেই চলেছে। কেউ আবার গিটার হাতে গান গাইছে। কেউ একা একাই রোদে শুয়ে আছে (সান বাথ)। কোথাও কয়েকজনের জটলা চলছে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।

কয়েকজন আবার ইসকনের ভক্তও আছে। তারা তিলক কেটে, ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে অনেকের সঙ্গেই ইসকন বা ধর্মের তেমন সম্পর্ক নেই। তারা আপন মনেই বসে আছে। বেশ কয়েকজনকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে দেখেছি। কাউকে গিটার হাতে রবি ঠাকুরের গান গাইতেও শুনেছি। অনেকেই আসার পথে কলকাতা বা দার্জিলিং হয়ে এসেছে। সবমিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি।

সেই অনুভূতির টানেই আরও তিনবার গেছি। তার মধ্যে একবার গরমের দিকে। সেবার তেমন বিদেশির দেখা মেলেনি। আরও একবার গিয়েছিলাম বৃষ্টির মাঝে। সেবারও অনাবিল আনন্দে তাদের বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেছি। কেউ দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ ঢেউ নেওয়ার পর আবার ফিরে এসে রোদে গল্প জুড়ে দিচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর হয়ত আরও একবার জলে ঝাঁপ। কখনও অমলেট, কখনও ডাবের জল চলছে। এমনকী মশলা মুড়িও দিব্যি উপভোগ করছে

সেই বিদেশি পর্যটকরা।

আসার সময় হেঁটে হেঁটেই সমুদ্রের পাড় ধরে দিব্যি ফিরে আসা যায়। এমনকী, যাওয়ার সময়েও অটো না করে আপনি হেঁটেও চলে যেতে পারেন। বাঁ দিকে পাড় ধরে দু আড়াই কিমি হাঁটলেই পেয়ে যাবেন। যাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই দেখিয়ে দেবে। সবমিলিয়ে ফরেনার ঘাট সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বেশ ভালই। কিন্তু যাঁরাই পুরী যান, তাঁদের অধিকাংশই ওদিকে পা মাড়ান না। হয় জানেন না। অথবা জানলেও তেমন আগ্রহ দেখান না। আশপাশের জায়গাগুলো তো রইলই। শীতের দুপুরে একবার ফরেনার ঘাট থেকে ঢুঁ মেরে আসতেই পারেন। পুরীর মধ্যে অন্য একটা পুরী আপনার মনে ছাপ ফেলতেই পারে।

ভ্রমণের লেখা মানেই কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা ছকে বাঁধা লেখা নয়। তার বাইরেও লেখার একটা বিরাট পরিসর থেকে যায়। বেড়ানোর টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা বা চরিত্রও লেখার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। শুধু সেটুকুই উঠে আসতে পারে আপনার লেখায়। আপনার অনুভূতি ভাগ করে নিন অন্যদের সঙ্গে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

নববর্ষ সংখ্যা

বেঙ্গল টাইমস

১৫ এপ্রিল, ২০২৬

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।
ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী